২। পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারকসমূহ (Determinants of Foreign Policy) :

প্রত্যেক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করে। ঐ নীতি এককভাবে নীতি-প্রণেতাদের ইচ্ছা ও বিবেচনার উপর নির্ভরশীল নয়। পররাষ্ট্র নীতির প্রণেতাগণকে বহু বিষয়ে বিবেচনার পর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। বহু উপাদানের দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত হন। যে-সব উপাদানের দ্বারা পররাষ্ট্র নীতি প্রভাবিত হয় তাদের পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক বলা হয়।

পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারকসমূহের মধ্যে ভৌগোলিক-সামরিক অবস্থান (Geographical-strategic location), জনসংখ্যা (Population),অর্থনৈতিক অগ্রগতি (Economic development), মতাদর্শগত পরিবেশ (Ideological enviornment), সামরিক সামর্থ্য (Military capability), ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার (Historical inheritance), সরকার, জাতীয় নেতৃত্ব এবং কূটনীতির গুণগত মান (Quality of Government, national leadership and diplomacy), প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সমাজের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ

(Behaviour of the neighbouring states and other members of the international society) বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারকের সংখ্যা অনেক। কোন বিশেষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে নির্দিষ্ট উপাদান মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এককভাবে কোন উপাদান পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারকে পরিণত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে, একাধিক উপাদান পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার মধ্যে কোনটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ উপাদানরূপে বিবেচিত হতে পারে।

আবার সময়ের পরিবর্তনের ফলে কোন উপাদানের গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আণবিক অস্ত্র এবং আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন, উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রতিটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে শক্তিধর রাষ্ট্রের নিকট লঙ্ঘনীয় ও ভেদ্য করে তুলেছে। সুতরাং পূর্বের ন্যায় ভৌগোলিক অবস্থান এখন আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক এবং সামরিক সামর্থ্য বর্তমানে গুরুত্ব অর্জন করেছে।

ক. ভৌগোলিক-সামরিক অবস্থান (Geographical-strategic Location) ঃ

ভৌগোলিক-সামরিক অবস্থান পররাষ্ট্র নীতির একটি স্থায়ী উপাদান বা নির্ধারকে পরিণত হয়েছে।

পররাষ্ট্র নীতির উপর ভূগোলের প্রভাবের দুটি দিক আছে ঃ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ এবং তার ভৌগোলিক অবস্থানের সামরিক-রাজনৈতিক গুরুত্ব। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ বলতে তার আয়তন, ভূ-ভাগ, জলবায়ু প্রভৃতিকে বোঝায়। রাষ্ট্রের আদর্শ ভৌগোলিক পরিবেশ হোল ঃ

(১) রাষ্ট্রের আয়তন এমন হবে যেন, অধিবাসীদের জীবনযাত্রার যথোপযুক্ত মান বজায় রাখতে সাহায্য করে ; (২) জলবায়ু কঠোর শ্রমের অনুকূল হওয়া প্রয়োজন ; (৩) ভূ-ভাগ জাতীয় প্রতিরক্ষার সহায়ক হওয়া দরকার। পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র-বেষ্টিত দেশ প্রাকৃতিক কারণেই বৈদেশিক আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা ভোগ করে ; (৪) রাষ্ট্রের আকৃতি (shape) এমন হওয়া প্রয়োজন যেন, সাবেকী যুদ্ধাবস্থায় নিজেকে সহজে রক্ষা করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের পক্ষেই আদর্শ ভৌগোলিক পরিবেশের আনুকূল্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

প্রতিটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তার পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করে। গ্রেট ব্রিটেনের ব-দ্বীপীয় (insular) অবস্থান অন্যান্য দেশের সঙ্গে সংযোগ প্রসারে সাহায্য করেছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ইউরোপ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি অনুসরণে সাফল্য অর্জন করেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং বিশাল আয়তন ও জলবায়ু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় তার গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। ভারতের জোট-নিরপেক্ষ নীতি তার ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে দুরত্বের ফলে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সমস্যাই বাংলা দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে সেখানকার জনগণের সহায়ক হয়েছিল। সেই একই কারণে ভারতের বিষয়ে পাকিস্তান সর্বদা সন্দেহ-পরায়ণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফ্রান্স ও জার্মানি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। জার্মানির সম্ভাব্য আগ্রাসনের ভীতি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতিকে প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানের প্রতি বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের উৎসাহের কারণ তার ভৌগোলিক-সামরিক অবস্থান। আফগানিস্তানে প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র সহজেই মধ্য-প্রাচ্য, পাক-ভারত উপ-মহাদেশ, এশিয়ার অন্তর্গত রাশিয়া এবং চীনের মনে ভীতি সঞ্চারিত করতে পারে।

পররাষ্ট্র নীতির উপর ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব থাকে। আবার ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা কোন রাষ্ট্রের সামরিক গুরুত্ব নির্ধারিত হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ভৌগোলিক অবস্থান কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির একক এবং এমনকি প্রাধান্যকারী নির্ধারক নয়। আন্তঃ-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, দ্রুতগামী বিমান, আণবিক মারণাস্ত্র সকল রাষ্ট্রকেই ভেদ্য করে তুলেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ভৌগোলিক উপাদান বা নির্ধারকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ. জে. পি. টেলর (A.J.P. Taylor)-এর মতে, বেশিরভাগ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিই তার অবস্থান এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আচরণের দ্বারা নির্ধারিত হয়।[১০] ব্লাক এবং টম্পসন উল্লেখ করেছেন, কোন দেশ বাস্তবে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার অধিবাসিগণ বিশ্বের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তোলে তার একটি ভৌগোলিক ভিত্তি আছে।[১১]

উপরি-উক্ত ধারণার মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। ভারত-পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অ্যাঙ্গোলার প্রান্তবর্তী রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র নীতিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

খ. জনসংখ্যা (Population) ঃ

জনসংখ্যাকে পররাষ্ট্র নীতির একটি উল্লেখযোগ্য নির্ধারকরূপে গণ্য করা হয়। দীর্ঘকালব্যাপী জনসংখ্যাকে রাষ্ট্রীয় শক্তি পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ডরূপে গণ্য করা হয়েছে। অতীতের যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর উপরই সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপিত হত। পঞ্চাশের দশকে কোরিয়ার যুদ্ধে গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিশাল পদাতিক বাহিনী মার্কিন বাহিনীর প্রতিরোধে সহায়ক হয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সরকারকে বিপুল-সংখ্যক সেনা নিয়োগ করতে হয়েছিল।

অনেকে মনে করেন যে, আণবিক অস্ত্রের প্রসারের ফলে পররাষ্ট্র নীতি তথা জাতীয় শক্তি নির্ধারণে সৈন্যসংখ্যার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। কারিগরী বিদ্যা এবং প্রযুক্তির বিকাশই প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সৈন্যসংখ্যার গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্যসংখ্যা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েনি। আণবিক যুগেও যুদ্ধের রসদ সরবরাহের জন্য বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। জনবহুল রাষ্ট্র যুদ্ধের অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় জনসম্পদের সাহায্যে নিজের সামর্থ্য আংশিকভাবে অব্যাহত রাখতে পারে।

কোন রাষ্ট্রের যুদ্ধের সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা এবং পররাষ্ট্র নীতির সম্পর্ক গুরুত্ব অর্জন করে। নাগরিকদের সকল অংশের মধ্যে সংহতি, রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ

জনসাধারণের গুণগত মান, রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষার প্রসার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা, জনমতের চাপ, সরকারের ধরন প্রভৃতির উপর পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে জনসংখ্যার গুরুত্ব নির্ভরশীল। তবে জনসংখ্যার পরিমাণের সঙ্গে তার গুণগত মানও বিশেষভাবে বিবেচ্য। নাগরিকদের দক্ষতা, সামর্থ্য এবং গুণগত মানই জাতীয় প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে।

গ. ইতিহাস (History) ঃ

প্রতিটি জাতির ইতিহাসের দ্বারাও তার পররাষ্ট্র নীতি প্রভাবিত হয়। বিশেষ পরিস্থিতির চাপে ও ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে প্রতিটি জাতির ইতিহাসের রূপরেখা গড়ে ওঠে। উদ্ভব ঘটে তার নির্দিষ্ট পরিচয় এবং স্বকীয়তার। ঐতিহাসিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমেই প্রত্যেক জাতির ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারিত হয় ; কোন জাতির বিকাশের ইতিহাসের দ্বারা পররাষ্ট্র নীতির অনেক মৌলিক বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রত্যেক জাতি তার পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি গঠন করে।

ভারত-বিভাগ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব উভয় দেশের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরিতা সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপের প্রবণতা গ্রেট ব্রিটেনের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাস হোল নিরাপত্তা অর্জনের ইতিহাস। এই কারণেই জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের প্রভাবের পরিমণ্ডলের প্রসার এবং সংরক্ষণের জন্য গণতান্ত্রিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও বিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

ভারত-চীন, পাক-আফগান সীমান্ত বিরোধ অথবা আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভূখণ্ডগত বিরোধ উপনিবেশিক শাসনের ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। আরব-ইজরায়েল বিরোধের উৎসও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের বিকাশের বৈশিষ্ট্য ও ধারার মধ্যে নিহিত।

ঘ. অর্থনৈতিক সম্পদ (Economic Resources) ঃ

অর্থনৈতিক সম্পদের দ্বারা ব্যাপকভাবে পররাষ্ট্র নীতির প্রকৃতি ও ধারা নির্ধারিত হয়। কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তি তার সামর্থ্যের সূচক। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐ সামর্থ্যের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান লক্ষ্য হোল উৎপাদনের জন্য দেশের ভূমি, শ্রম, পুঁজি এবং উদ্যোগের ব্যবহার। উৎপাদিত অর্থনৈতিক সম্পদের বণ্টন, ভোগ, জনকল্যাণ, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদিও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী দেশ সহজেই নিজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটাতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খনিজ তৈলে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে বলীয়ান দেশ সহজেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব কোন দেশকে অন্যান্য দেশের উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এর ফলে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা হ্রাস পায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, শিল্পোন্নত দেশসমূহ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন শিল্পে উন্নত হবার জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি প্রাধান্য অর্জন করেছে। ফ্রান্স, ইতালি, চীনও ক্রমান্বয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সাফল্য অর্জন করছে।

শিল্পোন্নত দেশসমূহ শুধু আন্তর্জাতিক বাজারই নিয়ন্ত্রণ করে না ; তারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকেও প্রভাবিত করে। শিল্প এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে অনুন্নত দেশসমূহ উন্নত দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য, শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ, উন্নত প্রযুক্তি আমদানি, আর্থিক সাহায্য এবং ঋণ গ্রহণ প্রভৃতি কারণে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ বৃহৎ শক্তিসমূহের কূটনৈতিক কৌশলের দিক থেকে দুর্বল দেশসমূহ এই কারণে নিজেদের নীতিকে অন্য দেশের উপর আরোপ করতে পারে না।

প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্পোন্নয়নই হোল কোন দেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তি। বর্তমান বিশ্বে শিল্পোন্নয়নের হার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষার সামর্থ্য নির্ভরশীল। আধুনিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় উন্নতমানের কারিগরী ও প্রযুক্তির প্রয়োজন। পারমাণবিক অস্ত্র এবং তারকাযুদ্ধের পরিকল্পনাসহ আন্তঃ-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ একমাত্র উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। এই কারণেই শিল্পোন্নত দেশসমূহ অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তারে সাফল্য অর্জন করেছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহ নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য নতুন বাজার দখল এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য প্রতিনিয়ত অনুন্নত দেশসমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

ঙ. মতাদর্শ (Ideology) ঃ

পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম নির্ধারক হোল মতাদর্শ। তবে অনেকে মতাদর্শের তুলনায় জাতীয় প্রয়োজন পূরণের বিবেচনার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। মতাদর্শই হোল কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রকৃতি, চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যের প্রধান দ্যোতক। প্রতিটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। কোন রাষ্ট্রের মূল্যবোধ, নীতি, কর্মসূচী, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ঐ মতাদর্শের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মতাদর্শের দ্বারা কেবল কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নীতি ও মূল্যবোধই নির্ধারিত হয় না ; পররাষ্ট্র নীতিও ঐ মতাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের পররাষ্ট্র নীতির পার্থক্যের বিষয় উল্লেখ করা যায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক শান্তি, মৈত্রী, পারস্পরিক সহযোগিতা, অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগ, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি দ্বিধাহীন সমর্থন জ্ঞাপনের নীতিতে বিশ্বাসী। মার্কসবাদ সকল প্রকার শোষণ এবং নিপীড়নের বিরোধী। এই কারণেই পররাজ্যলোলুপতা এবং আগ্রাসী নীতি অনুসরণ সম্পূর্ণরূপেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি-

বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে এই মতাদর্শগত অঙ্গীকার অভিব্যক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, পুঁজিবাদ স্বদেশে ও বিদেশে শোষণ এবং নিপীড়নের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এই কারণেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী দেশসমূহ আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে।

মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্যই আওর্জাতিক ক্ষেত্রে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পর-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সমস্যা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিন্নমত পোষণ করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতাদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক রাষ্ট্রই সহনশীলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রিত বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা মেনে চলে। মতাদর্শগত প্রচার থেকে যেমন কোন রাষ্ট্র বিরত থাকে না, ঠিক তেমনি কোন রাষ্ট্রই বর্তমানে অন্য মতাদর্শাবলম্বী রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে পারছে না। সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপই তার মুখ্য কারণ। এই জন্যই আপাতদৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাদর্শের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। তবে এই সহাবস্থান কখনও চূড়ান্ত ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না।

চ. সরকারের দক্ষতা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রকৃতি (Efficiency of Government and Nature of Political Leadership) ঃ

সরকারের দক্ষতা ও সামর্থ্য এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতা, চাতুর্য এবং বুদ্ধিমত্তার উপরেও পররাষ্ট্র নীতি নির্ভরশীল। কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ ব্যবস্থা কার্যকর হবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে, জাতীয় নেতৃবৃন্দই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকারের উদ্যোগ ও নেতৃত্বেই সম্ভাবনাসূচক ক্ষমতা প্রকৃত ক্ষমতায় পরিণত হয়। সরকারের জনপ্রিয়তা, সুসংবদ্ধ প্রশাসনিক কাঠামো, তথ্য সংগ্রহ এবং বিন্যাসে সরকারী তৎপরতা, পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীদের যোগ্যতা পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন এবং পররাষ্ট্র-বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

সরকারের নেতৃবৃন্দই পররাষ্ট্র নীতির প্রধান উৎস এবং শক্তি। ব্লাক এবং টম্পসন (Black and Thompson)-এর মতে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্র কি ভূমিকা পালন করবে এবং কি ধরনের পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের গুণগত মানের উপর নির্ভরশীল।[১২] সরকারী নেতৃত্বের উৎকর্ষের উপর যে পররাষ্ট্র নীতির উৎকর্ষ নির্ভরশীল উলফারস (Wolfers) সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যায় যে, পররাষ্ট্র নীতিকে কোন অবস্থায়ই সরকারী নেতৃত্বের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সরকারের নেতৃবৃন্দের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা, ব্যক্তিত্ব, বিশ্ব-রাজনীতির অনুধাবন প্রভৃতির দ্বারা পররাষ্ট্র নীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে বাধ্য। এই কারণে একই রাজনৈতিক দলভুক্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যেও পররাষ্ট্র-বিষয়ক প্রশ্নে দৃষ্টিকোণজনিত বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। জন এফ. কেনেডি এবং লিন্ডন জনসন উভয়েই ডেমোক্র্যাটিক পার্টিভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে

তাঁদের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য ছিল। ভারতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালীন পররাষ্ট্রনীতির গতিশীল চরিত্রের পার্থক্য ছিল।

ছ. কূটনীতির গুণগত মান (Quality of Diplomacy) ঃ

কূটনীতির গুণগত মানের উপরও পররাষ্ট্র নীতি নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক সমাজে কোন রাষ্ট্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা তার কূটনৈতিক কৌশল এবং উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। কূটনীতির উৎকর্ষ জাতীয় লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা, রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কিত কৌশল ও অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগের সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের প্রতিটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ সরকারের কূটনৈতিক চাতুর্যের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমেই পররাষ্ট্র নীতির সকল লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই মূলত অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন এবং মতপার্থক্যের সমাধান করা হয়। কূটনীতিবিদগণই বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি স্থির করেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভারতের কূটনীতিবিদগণ বিদেশী রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলী ও জনসাধারণকে ভারতের বক্তব্য ও সমস্যা অনুধাবনে যত সফল হবেন ভারতের পররাষ্ট্র নীতিও তত বেশি সফল হবে। তবে ভারতের অনুকূলে তাদের মতামত সৃষ্টি হবে কিনা, তা নির্ভরশীল কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার উপর। তা ছাড়া পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা, সময়োপযোগী পদক্ষেপ, সঠিক এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন কূটনৈতিক সাফল্যের প্রয়োজনীয় শর্তরূপে বিবেচিত হয়।

উপরি-উক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পররাষ্ট্র নীতি বহু উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত । স্থান ও কালভেদে কোন বিশেষ উপাদান অন্যান্য উপাদানের তুলনায় গুরুত্ব অর্জন করতে পারে। অনেক পরিস্থিতিতে কোন উপাদান বা নির্ধারক অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। আবার স্থান অথবা সময়ের পরিবর্তনের ফলে সেই উপাদানই প্রধান নির্ধারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ছাড়াও কয়েকটি উপাদান যৌথভাবে পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সুতরাং কোন বিশেষ নির্ধারকের ভূমিকা সম্পর্কে কোন সর্বজনীন তত্ত্ব গঠন সম্ভব নয়।